চতুর্থ অধ্যায়

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকীয় বাংলা কবিতায় লোকবীক্ষা

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের অনেক কবিই এপার বাংলায় অন্তর্লীন লোক-চেতনার দ্বারা কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এই প্রভাবের ফলশ্রুতি কবিতার লোক- ঐতিহ্য সমৃদ্ধ রূপ রস সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, জীবাশ্ম আর জীবন এক নয়। লোকযান মিথষ্ক্রিয়ার জীবাশ্মের মধ্যেই এ যুগের অনেক কবি কবিতায় জীবন খুঁজে পেয়েছেন। দৃশ্যমান আইসবার্গের টিপস-এর চেয়েও যে বড় সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জমান তার তিন চতুর্থাংশ, তেমনই সত্য কাব্যে আহৃত লোক সংস্কৃতির গুটি কয়েক উপাদান ছাড়া লোকচেতনা- যা অন্বিত লোকমানসে- যাকে কবিরা সন্ধানী লোকবীক্ষায় কাব্যে অমর করে রাখেন। এমন অনেক কবিদের মধ্যে কয়েকজন হলেন শঙ্খ ঘোষ, মনীন্দ্র গুপ্ত, পার্থ প্রতিম কাঞ্জিলাল, নিশীথ কর, অমিতাভ দাশগুপ্ত, নির্মল হালদার, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, গৌতম বসু, আল মাহমুদ, রফিক আজাদ খোন্দকার, আশরাফ হোসেন, আব্দুস শুকুর খান, জয়নাল আবেদিন, নুরুল আমিন বিশ্বাস, আসিকুর রহমান, এম নাজিম, শাহের আলম সেলিম, সৈয়দ শীষ মোহাম্মদ, আব্দুল বারী, কবিরুল ইসলাম, আবনিয়াজ বেগম, নাসিরুদ্দিন খান, মাজরুল ইসলাম, ইনাস উদ্দিন, মীর সাহেব হক, এমাদুল হক প্রভৃতি।

রফিক আহমদ ঃ কবি রফিক আহমদের কবিতায় লোকজ শব্দের মৌলিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজ' নির্ভর লোক সংস্কৃতি সমন্বিত জীবন যাত্রার পরিচয়। তাঁর অনেক কবিতা লোকায়ত গীতিকার মতো দেশজ ঐতিহ্য মন্ডিত। তাঁর 'দুনিয়া আমার অর্কেডিয়া' কবিতায় পাই -

'তুমি চাও মাটির উনুন। শানকিতে সাদা ভাত
পরিমিত নুন, স্বাদু তামাকের তাবু।
শাড়ির ভিতরে এক আলু থালু নরম শরীর
শীতল পাটির সুখ, হাত পাখা, আসার পিদিম।'

এখানে লোক জীবনের টুক্‌রো টুক্‌রো উপাদান মাটির উনুন, শানকি, সাদা ভাত, নুন, তামাক, শীতল পাটি, হাতপাখা একত্রিত হয়ে কাব্যকায়া নির্মিত হয়েছে। লোক-উপাদান গুলির শিল্পিত প্রয়োগ ঘটায় কবিতাটি এখানে বিশেষ মাত্রা পায়।

শিশির সামন্ত ঃ অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর কবিতায় পরিচিত লোক জগতের একাধিক টুকরো টুকরো চিত্র স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সামগ্রিক কোনো বাক্‌-প্রতিমা নির্মাণের প্রচেষ্টা নয়, বিভিন্ন অংশের পরস্পর নিরপেক্ষতায় চিত্রগুলি দানা বেঁধে ওঠে। তাঁর 'আলোকিত হাততালি' কবিতাটিকে উদাহরণ হিশেবে নেওয়া যেতে পারে -

ত্রস্ত কৃষাণীর লব্ধ নিরন্তর অহমিকা শুধু থাকে
অহমিকা গ্রামদেশ, ফড়িং-এর জলের উপর নাচ
মন ক্রমে চলে যায়, মেঠো আলিঙ্গনে।

লক্ষ্যনীয়, এখানে কোনো ভাবগত বিচ্ছিন্নতা নেই।

নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী ঃ ইনি পূর্ব বাংলার মানুষ। ফরিদপুর জেলার ছোট একটা গ্রামে তার জন্ম। জীবনের কয়েকটা বছর তাঁর সেখানেই কাটে। বাবা-মা কলকাতায় থাকেন। তিনি থাকেন গ্রামের বাড়িতে তাঁর পিতামহ আর পিতামহীর কাছে। কবির স্বীকারোক্তি, 'সেই পরিবেশ আমার কবিতায় ঘুরে ফিরে উঁকি মেরেছে। 'আচমকা ঘুরছে হাওয়া' কবিতায় তিনি লিখেছেন-

দুচারটি প্রজাপতি এখানে ওখানে ওড়াওড়ি করে
বিকেল বেলার রোদে সলজ্জ হাসছে গাছ-গাছালির পাতা।'

গ্রাম বাংলার অসংখ্য উপাদান তাঁর কাব্য-কায়ায় সমীভূত হয়েছে।

আল মাহমুদ ঃ লোক উপাদান ও লোক-মানসিকতা কবিচেতনাকে কী গভীরভাবে প্রভাবিত করে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় তার স্বাক্ষর রেখেছেন ওপার বাংলার কবি আল মাহমুদ। 'জন্ম দিনের কবিতা'য় তিনি লিখেছেন -

আমার মা বনকচুর ছড়া, বাঘা তেতুল মিশিয়ে
শুট্‌কি সহযোগে যে ঘেট তৈরি করতেন

তার জন্য ভেতর থেকে আমার ক্ষিদে মোচড় দিয়ে উঠেছে।

খেতে দে শিদলের স্বাদ,
টাকি মাছের মাথা ভেঙ্গে সেই অদ্ভুত ঘেট,
যা একদা আমার অতি অনাথ পূর্ব পুরুষেরা
মাটির সানকিতে পরমান্ন হিশেবে সাজিয়ে দিতেন।'

আল মাহমুদ গভীর মনের অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁর কবিতায় পাই রূপ-অরূপ লোকের অস্তিত্ব। তাঁর মানসিকতায় রয়েছে পূর্ণতার দ্যোতনা। লোক-চৈতন্যে সমৃদ্ধ তাঁর কবি চেতনা দেশ কালের সীমানা অতিক্রম করে অনায়াসেই। এপার বাংলার কবি আল মাহমুদের এমন কিছু কবিতাংশ উল্লেখ করব যেখানে লোক-চেতনার সঙ্গে মিশে আছে দেশের পারিপার্শ্বিক লালপুর গাঁয়ের নদী, জামদানির ওপরে দৃশ্যমান বাংলাদেশের নক্‌সা, মেদির হাওর, ধানকাটা মাঠ। এসব কিছুই লোক-ঐতিহ্যে ঋদ্ধবাক্য স্পন্দন।

(১) "চেয়ে দেখি
লালপুর গাঁয়ের গাবগন্ধী নদীর ভেতর নেমেছে একদল ধীবর বৌ
গুটোনো শাড়ির নিচে নগ্ন হাঁটু যেন
ইলিশ মাছের কাটা মাথা উন্মুক্ত হয়েছে ভোরবেলা।"
(তোমাতেই ফিরে আসি / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

(২) "ক্ষুধার্ত বুনো হাঁসের দল
নেমে এসেছে মেদির হাওরে।"
(কালঘুম/ শ্রেষ্ঠ কবিতা)

(৩) "ধানকাটা হয়ে গেছে আমি শুনি সহস্র ইদুঁর এসে
হুটোপুটি করে যায় হেমন্তের শুন্য-মাঠে
সবই শুন্য মাঠে
ভূমিহীন কিষাণের অফুরন্ত নিঃশ্বাসের হাওয়া।"
(মাৎস্য ন্যায় / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

(৪) "তাঁর চোখে বিবমিষা। যেন মেঘনা পারের রসিক জেলে যুবতীরা
মজা করে তাকে সিদলের ঝাল ভর্তা খাইয়ে দিয়েছে।"

(বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

(৫) "পাখি উড়ছে কোয়াক্ কোয়াক্ করে ডাকছে
একটি যাযাবর হাঁস। এক মাঝি
পালের দড়িদড়া ঠিক করতে করতে
গাইল, মন মাঝি তোর বইঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।"

(আমি সত্যের পাশে / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

(৬) "দূরবর্তী কোনো গ্রামে নদীর পাড়ের সেই বাড়ি
লোকজন নেই কেউ, বিধবা ফুপুর সাথে এক খাটে
একটি লেপের নিচে শোয়া
অসহায় দুটি প্রাণী.... ।
আমার বিষয় তাই, যা গরীব চাষির বিষয়।"

(কবির বিষয় / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

(৭) তাকে দেখে কিষাণেরা অবাক সবাই
শষ্যের শিল্পীরা একগাদা বিচালি বিছিয়ে দিতে দিতে
ডাকল তাকে, সস্নেহে বলল, 'বসে যাও।
আমাদেরই লোক তুমি। তোমার বাপের
মারিফতির টান শুনে বাতাস বেহুঁশ হয়ে যেত।
তোমাকে বসতে হবে এইখানেই
তাদের জানাতে হবে কুহলি পাখির পিছু পিছু
কতদূর গিয়েছিলে পার হয়ে পানের বরজ।

(খড়ের গম্বুজ / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

কবিতা যদি মানুষে মানুষে মিলনের উপাদান, উপকরণ ও মাধ্যম হয়, কবিতার ভিতর দিয়ে যদি সম-অনুভবের মুক্ত চিন্তা ও পরিশীলিত বাস্তব-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি সমাজকে গতিশীল করে, তবে কবিতায় জীবনের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, জীবনের ভূমিজ উপকরণের চলমান প্রেক্ষাপটে মানুষের অন্বেষণ বা লোকবীক্ষা, দর্শন ও সমীক্ষার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব হয়।

কবিকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় অস্তিত্বের কঠিন মূল্যে। তাঁর সত্তার পাকে পাকে জড়িয়ে থাকে অতীতের দিন রাত্রির অসংখ্য নর-নারীর মুখের মিছিল। কবির রক্তের মধ্যে বিপুল তরঙ্গাবেগ জাগিয়ে তোলে মৃত্তিকালগ্ন কঠিন বাস্তব জীবনের প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা ভাবাবেগের বাষ্পপুঞ্জ নয় - জীবনের অকৃত্রিম পাঠ।

কবি লোকজীবন ও সংস্কৃতিক্ষেত্র থেকে শিল্প প্রেরণা ও মূল্যবোধ সংগ্রহ করেন। দেশজ কাব্য-সাহিত্যের পাঁচালি, গাথাকাব্য, কবিগান ও রামায়ণ-মহাভারতের অন্তর্নিহিত সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণরস ও চিরায়ত জীবনাদর্শ কবির রসদৃষ্টি ও জীবনবোধকে অনুপ্রাণিত করে। ঐতিহ্যমূলক আদর্শের আলোয় কবি দীর্ঘ পথ চলেন। সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয় কবিতার নানা প্রবণতা ও পরিণাম। বিপ্লব চক্রবর্তীর ভাষায়, 'কবিতার নির্মাণের ক্ষেত্রে লোকজীবন থেকে আহৃত বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে কবি নব নির্মাণ বা নতুনতর সৃষ্টিতে মগ্ন থাকেন। এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় লোকজীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র উপাদান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়।'[১]

নির্মল হালদার ঃ অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের অনেক কবিই এপার বাংলার অন্তর্লীন লোক-চেতনার দ্বারা কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এমনি একজন কবি এপার বাংলার নির্মল হালদার। তাঁর অসাধারণ এক কবিতা 'গিরিবালা' -

> ''গিরিবালা নাক বিঁধাল
> গিরিবালার নাকের ফুটোয় ফুল গুঁজে দেব।
> আমাদের সোনা নাই রূপা নাই
> ফুল ফুটিয়ে ফুল গুঁজে দেব

গিরিবালা রাগ করিস না।

আসছে বছর গমের ফলন বেশি হলে

গড়িয়ে দেবো নাকের নোলক।"

'নাক বিধাঁল', 'নাকের নোলক' শব্দবন্ধ লোক-চেতনার সংলগ্নতার সূত্রে আবদ্ধ। মহৎ কবি মাত্রেই লোক-ঐতিহ্য বিষয়ে সচেতন। কবিতা এক ঐতিহ্য মন্ডিত শিল্প কর্ম বলেই প্রকৃত অর্থে কবি হন লোক-উপাদান সচেতন লেখা-কর্মী। ম্যাক্সিম গোর্কির অনুকরণে বলা যায় যে কবি হচ্ছেন তাঁর দেশের ও সমাজের চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয়-এক কথায় তাঁর যুগের বাণী ও প্রতিনিধি। লোক জীবনের সাথে কবির পরিচয় যত বেশি থাকবে, ততই তিনি তাঁর কবি-কর্মের পরিধি তীব্র ভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। সামনের দিকে চলতে চলতে কবি তাঁর সমাজের নানা পুরোনো উপাদানও বীক্ষণ করেন। এই বীক্ষাই হল লোকবীক্ষা। এ না হলে কবির চলা অস্পূর্ণ থেকে যায়। কবি নির্মল হালদারের শিল্প মানসে আছে সুগভীর লোক ঐতিহ্য-মনস্কতা। তাই জীবনের অতি তুচ্ছ উপাদানও তাঁর কাছে অনুরাগ-দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্য গ্রন্থের 'শিশুর কথা' কবিতায় দেখি -

"একলা দাঁড়িয়ে থাকা বক,

নদী থেকে উঠলেই ফসলের ক্ষেত,

কাক তাড়ুয়ার জামা দুলছে হাওয়ায়।"

'বক', ফসলের ক্ষেত', 'কাকতাড়ুয়া'- এ সবই লোকযানের অঙ্গবিশেষ। আবার 'কুয়োতলায়' কবিতায় পাই -

"অনেক দিনের কুয়ো

রাস্তার পাশেই কুয়ো

বালতি নামে, বালতি ওঠে

উঠে আসে পুরোনো পাতা, পচাপাতা।"

(শ্রেষ্ঠ কবিতা)

লোক-সংস্কৃতির অতি তুচ্ছ উপাদানগুলি আত্মস্থ করে কবি যেমন মহৎ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি গ্রাম-জীবনের ঐতিহ্যের প্রতিও তাঁর গভীর টান লক্ষ্য করা যায়।

নির্মল হালদার ঃ কবি নির্মল হালদারে কাছে 'দেশ' একদিকে ভৌমিক, অন্যদিকে মানসিক। 'খোলাম কুচি' কবিতায় দেখি -

"গাই-গরুর পিছনে পিছনে ছুটে যাই
মনে মনে প্রার্থনা করি ঃ হে ঠাকুর, গোবর দাও।
ঝুড়ি ঝুড়ি গোবরে ভরে ওঠে মন
ঝুড়ি ঝুড়ি গোবরেই ঝুড়ি ঝুড়ি ঘুঁটে
ঘুঁটে বিক্রি করেই আমাদের শাকভাত।"

লোকজীবনের সাথে কবি কিভাবে নিজেকে অন্বিত করেন তার যথার্থ উদাহরণ উপরের কবিতাংশটি। কবির মধ্যে পাই যথার্থ লোক-মনস্কতা। লোক-জীবনের সঙ্গে নিজেকে গভীরভাবে জড়িয়ে নিতে পেরেছিলেন বলেই কবি অনায়াসে লিখতে পারেন -

"আমরা চৌকাঠ পেরিয়ে
কুলুঙ্গিতে দেশলাই খুঁজি।
বাবা বিড়িতে আগুন চাইছে
মা চাইছে লম্ফতে আলো
আমরা মায়ের কাঁথা সেলায়ের ছুঁচে
সুতো পার করে দিই।"

(তিন ভাই / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

চৈতালি চট্টোপাধ্যায় ঃ লোক জীবনের বিভিন্ন উপাদানকে চৈতালি চট্টোপাধ্যায় নান অনুষঙ্গবাচক শব্দ ব্যবহারের দ্বারা কাব্যে শরীরী করে তোলেন। 'ভারতবর্ষ' নামের বাড়িটির কথা বলতে গিয়ে 'ফ্রেম' কবিতায় তিনি দারিদ্রের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক যুক্ত কিছু শব্দ ব্যবহার করে দেখাচ্ছেন কিভাবে স্বাধীনতার পরেও মরে বাঁচার স্পৃহা রয়েছে মানুষের -

"তাদের গায়ে ছেঁড়া কাঁথার রোদ পড়েছে
ওই রেখাটির নাম দারিদ্র রেখা।
গোবর নিকোনো শেষ হলে
চৈত্রের-হাওয়ায় উড়ল ময়লা আঁচল
জানলায় দরজায় সারি সারি
শাশুড়ি সতীনের চোখ
শোনো, এই বাড়িটির নাম ভারতবর্ষ।"

বাঁচার অদম্য স্পৃহা আছে বলেই 'গোবর নিকোনো', 'ছেঁড়া কাথার রোদ', 'ময়লা আঁচল ওড়া'। এখানে বাঁচার কথাটা গুরুত্ব পেয়েছে উপরোক্ত শব্দবন্ধের ব্যবহারে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত ঃ কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কবিতা রচনা শুরু করেন। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা 'আমাকে সম্পূর্ণ করে নাও'। এই কবিতার এক জায়গায় আছে -

"সে মেয়ের পায়ে গোরহরা, পরনে সীতাশাড়ি-
সিঁথি আর কপালে মোটা আঁচড়ে মেটেসিদুঁর
পায়ের ওপর-পাতায় পদ্ম
হাতের চেটোয় গাঢ় মেহেদি মাখা।"

'দেশের ভিটেয় মাটি ছেনে' এই ধরনের 'মৃন্ময়ী' গড়েন অমিতাভ দাশগুপ্তের 'আমাকে সম্পূর্ণ করে নাও' কবিতার পাগল জয়রাম কাকা। কবির মধ্যে যে লোক-চেতনা তা-ই কবির কাব্যশৈলীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। একাধিক পদ ও একাধিক বাক্যের অন্বয়ে লোক-উপাদানের প্রয়োগ এখানো শিল্পময়।

শঙ্খ ঘোষ ঃ বিংশ শতকের অন্ত্যলগ্নে এসে কবি শঙ্খ ঘোষ 'জন্মদিন' কবিতায় লিখেছেন-

"আবার আমাদের দেখা হবে কখনো
দেখা হবে তুলসী তলায়
দেখা হবে বাঁশের সাঁকোয়
দেখা হবে সুপুরি বনের কিনারে।"

উপরোক্ত বাক্যগুলিতে যে শব্দবন্ধ- 'তুলসী তলা', বাঁশের সাঁকো', 'সুপুরি বনের কিনারা' তাতে রয়েছে ভাবানুয়ী লোকাভরণ। লোক-জীবনের তিনটি উপাদান এখানে কাব্য-কায়ার সাথে সমীভূত হয়ে অর্থদ্যোতনায় উজ্জ্বল হয়েছে। লোকচেতনা এখানে কবির বর্ণনাভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

অনেক পূর্বসুরীদের মতো অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিরাও উপলব্ধি করেছেন যে লোক-সংস্কৃতি তাঁদের জীবন-দর্পণই শুধু নয়, প্রাণের স্পন্দন। তাঁরা এই সত্যে সুস্থির হলেন যে আমাদের সভ্যতার ইতহাস- আগে গ্রাম জীবনে বেড়ে ওঠা, তারপর বিভিন্ন প্রয়োজন ও জটিলতার মধ্য দিয়ে শহর জীবনে প্রবেশ। বর্তমান সভ্যতার শহুরে প্রকোপ আমাদের চেতনাকে করেছে অতীত-বিস্মৃত এবং নির্মমভাবে উদাসীন। অথচ মানুষের মন শেকড়ের সন্ধানে, ঐতিহ্যের অন্বেষণে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত। সেই অন্বেষণের কাব্যিক ফসল অনেক কবিই তুলে দিয়েছেন আমাদের হাতে। বেঁচে থাকার সংগ্রাম যে শুধু নগরজীবনেই সীমাবদ্ধ নয়, গ্রামজীবনেও যে আছে সেই সংগ্রাম, অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের এপার-ওপার বাংলার কবিরা সে কথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন তাঁদের কবিতায়। এদের কবিতায় প্রতিবাদ ও জীবনযন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছে কখনো লোক-জীবন অবলম্বিত উপাদান ব্যবহারে, কখনো বা লোকশৈলীগত বিশিষ্টতায়।

মনীন্দ্র গুপ্ত ঃ অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় যদি কোনো দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে থাকে তবে তা মূলত সম্ভব হয়েছে কবিদের লোক-জীবন নিরিক্ষায়। কবিতা গুণান্বিত হয়ে ওঠে শৈলী বা রীতির দ্বারা। ভাষা-প্রতিমার যে আকার কবিরা দেন তাতে থাকে ভারসাম্য। মাত্রাজ্ঞান না থাকলে কবিতায় ভারসাম্যের শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব নয়। কবিতায় শব্দ সাজাতে হয়, শব্দের দ্বারা বাক্য নির্মাণ করতে হয়। কাব্যের আত্মা নির্মাণে শব্দ মন্ত্রের গুরুত্ব তাই অসীম। লোক-জীবন থেকে নানা শব্দ গ্রহণ করে মনীন্দ্র গুপ্ত 'বিদায়' কবিতায় লেখেন -

"ঘাটের নৌকা বাঁধার খুটোটা
যতক্ষণ দেখা যায় দাঁড়িয়ে আছে।

তেপান্তরে নামবার আগে লোকালয়ের শেষ সীমায়
দেবীর থানের হাঁড়িকাঠ এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল ।"

'নৌকা বাঁধার খুটোটা' এবং 'দেবীর থানের হাঁড়িকাঠ' অলৌকিক স্বর্গীয় বাকপ্রতিমা নির্মাণ করে না । কারণ এগুলি দেশীয় ঐতিহ্যের শিকড় - যা একান্তভাবেই লৌকিক ও মৃত্তিকা-সম্ভব ।

শামসুর রহমান ঃ অসীম বৈচিত্রময় জগতের নানা খন্ড উপকরণ কবি-মনকে আলোড়িত করে । কবির চেতনা নিত্য-নিরন্তর প্রবাহিত বলেই সেখান থেকে আনন্দ-বিষাদ-বিস্ময়ের প্রকাশ । কল্পনার বাষ্পে, চিন্তার আভাসে, ভাষার গুঞ্জনে কবি আমাদের জাগিয়ে তোলেন । শামসুর রহমান সম্বন্ধে একথাটা বড় বেশি সত্য বলে মনে হয় । তাঁর একটি অমর কবিতা 'আসুন আমরা আজ'-এ ছড়িয়ে আছে লোকজীবনের নানা খন্ড উপকরণ -

"খোলা ছাদ কবুতরময় মসজিদের গম্বুজ,
জীর্ণ বাস, জ্যোৎস্নারাত, নদী-নালা, পিয়ালের ডাল
কচুরিপানা, বাবুই পাখির বাসা, সর্ষে খেত,
নৌকার নয়ন, ডুরে শাড়ি অথবা নয়ানজুলি"

অবাক হতে হয়, লোক-জীবন থেকে আহৃত এত অসংখ্য শব্দ কিভাবে পাশাপাশি বসে কবিতার চরণে খাপ খেয়ে যায় । এখানে কবি কোনো স্বপ্নজগৎ নির্মাণ করেন নি । একটা প্রত্যক্ষ জগৎ, একটা চর্মচক্ষুতে দেখার জগৎ, একটা লোক অভিজ্ঞতার জগৎ সৃষ্টিতে কবি এখানে সার্থক ।

অসংখ্য লোক-উপাদান অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিদের কাব্যশৈলী নির্মাণের সহায়ক হয়েছে । শিল্প নৈপুণ্যে লোক-উপাদান কাব্যে সৌন্দর্য উপাদানে পরিণত হয়েছে এযুগের অসংখ্য কবিতায় । লোক-সংস্কৃতির অসংখ্য অধ্যায় থেকে কবিরা নানা উপাদান চয়ন করে পদ-সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন । রবীন্দ্রকাব্যে যার সূচনা এযুগের কবিতায় তা-ই বহুব্যপ্ত হয়েছে । এমন অনেক কবির কবিতা আছে যেগুলি লোককথার উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছে । অনেক সময় কবিরা সরাসরি লোক-উপাদান ব্যবহার না

করে ভাব-অন্বয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লোক-প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন । লোক-জীবনবীক্ষার ফলে লোকজীবনের যে উপাদান কবিরা সংগ্রহ করেছেন, কবিতায় তা শিল্পরূপ লাভ করেছে এইভাবে -

"এটা হল বোয়াল মাছের দেশ ।
কাল বোয়াল ধলি বোয়াল, সোনা বোয়াল ও
সাদা বোয়ালে অব্যাহত বিচরণ ভূমি ।
খাল-বিল, ডোবা-নালা ও হাওরে
একছত্র বোয়ালেরই রাজত্ব ।"

(মাৎস্যন্যায় / শ্রেষ্ঠ কবিতা -আল মাহমুদ)

কবি যে 'বোয়াল মাছের দেশ' -এর কথা বলেছেন সেই বাংলাদেশ একটি স্থানীয় সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ সুবিশাল সমৃদ্ধশালী ক্ষেত্র । এখানে বাংলা ভাষায় গীত-কথা-ধাঁধা-প্রবাদ-ছড়া পরম্পরাগতভাবে আজ যেন এক বিচিত্র পুষ্প-পল্লব শোভিত উপবন বিশেষ । উপরোক্ত কবিতাংশে রয়েছে বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতির এমন এক উপাদান যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভরপুর । একমাত্র এ দেশের বোয়ালমাছের একছত্র রাজত্ব । কবে কোন্ কালে রচিত এক ছেলে ভুলানো ছড়ায় এই বোয়ালমাছের প্রসঙ্গে পাই —

"আয়রে আয় টিয়ে নায়ে ভরা দিয়ে
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তাই না দেখে ভোঁদড় নাচে .... ।"

এই বাংলাদেশের প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে লোকজীবনের প্রাণভোমরা-যাকে বীক্ষণ করে 'চতুর্দশপদী' কবিতায় আল মাহমুদ লেখেন -

"বালি ওড়ে কীর্তিনাশা নদীর কিনারে
পেট থেকে কাদা খোঁচা পাখি এক
কাদা খোঁচে আহার্যের খোঁজে ।"

(শ্রেষ্ঠ কবিতা)

হরেন গোস্বামী ঃ অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের এক কবি হরেন গোস্বামী, ১৯৯৬ সালে তিনি

লেখেন 'রাত শেষ হলে' কবিতাটি। এই কবিতাটি প্রমাণ করে, প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা সাধারণ মানুষের সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনে শ্রমসাধনা বা কর্মশক্তির শরিক কবি নিজে -

''যখন সূর্য উঠবে
তুমি
রোদের স্নিগ্ধ জলে
নেয়ে নেবে
যখন প্রভাত হবে
আমি
কাস্তে কোদাল হাতে
কিষাণের সাথে কোনো
বন্ধ্যা জমিতে রোজ
সোনা খুঁড়ে তুলব।''

(শারদীয় 'উন্মোচন', ১৯৯৬ / নদীয়া)

অরুণ মিত্র ঃ লোক-জীবনকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি-জীবন প্রয়াসের পরিমণ্ডল বিকশিত হয় অরুণ মিত্রের কবিতায়। কবি গ্রাম-জীবন তথা লোক-জীবনের সাথে নাড়ির বন্ধনে আবদ্ধ। সেই জীবনকে পরিমার্জিত করার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই তাঁর 'এ জ্বালা কখন জুড়োবে' কবিতায়। নিজস্ব ছন্দোময় গতিতে যে গ্রামজীবন তৈরি হয়েছে তাকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবি বিকশিত করেন তাঁর কবিতায় -

''এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?
আমার এই বোঝা মাটির ছাতি ফেটে চৌচির।
উঠোনের ভালবাসার ভোর একমুঠো ছাই
হয়ে ছড়িয়ে যায় শুকনো লাউডগার মাচায়,
খড়ের চালের কাঠবিড়ালীর মতো পালায়
অনেক দিনের আশা, শুধু ভাসা ভাসা

কথার শুন্যে লেগে থাকে এক জলমোছা
জ্বলজ্বলে দৃষ্টি দুপুরের সূর্য হয়ে ।''
(সমীক্ষা / শারদ সংখ্যা, ১৯৯৮ / রত্না প্রকাশন
/ ২/৭৩ বিবেকনগর, কলকাতা -৭৫)

সাগর চক্রবর্তী ঃ কবি সাগর চক্রবর্তী তাঁর লোক-জীবন অভিজ্ঞতাকে শুধু স্মৃতিতে ধারণ করে রাখেন নি, তাঁর উপলব্ধ জীবন-সত্যকে কবিতায় সঞ্জীবিত ও বেগবান করেছেন এইভাবে -

''কবে যেন রোদের মাঠের ওপর দিয়ে
ধুলো উড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে কারো
শান বাঁধানো কুয়ো তলায় এসে দাঁড়ালাম
ছোঁবো কি ছোঁবো না
রোদের মধ্যে-দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে
দেখতে পেলাম চিরল চিরল পাতার গহন ছায়া
মাটির ওপর দুলছে হাওয়ায় বুক জুড়ানো ঘরের মায়া
ডাক দিয়েছে ঃ আয় ।''
(সমীক্ষা / শারদ সংখ্যা, ১৯৯৮
বিবেকনগর, কলকাতা -৭৫)

শঙ্খ ঘোষ ঃ কবিতা যদি মানুষে মানুষে মিলনের উপাদান, উপকরণ ও মাধ্যম হয়, কবিতার ভিতর দিয়ে যদি সম-অনুভবের মুক্ত চিন্তা ও পরিশীলিত বাস্তব-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি সমাজকে গতিশীল করে, তবে কবিতায় জীবনের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় । শুধু তাই নয়, সেই কবিতায় জীবনের ভূমিজ উপকরণের চলমান প্রেক্ষাপটে মানুষের অন্বেষণ বা লোকবীক্ষা, দর্শন ও সমীক্ষার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব হয় । কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতা সম্পর্কে এই কথাগুলো বড়ো বেশি সত্য বলে মনে হয় । তাঁর 'জাবাল সত্যকাম'' কবিতায় আছে নিরপেক্ষ জীবন-মুখী দৃষ্টিভঙ্গি যা কবি চেতনায় উন্নীত হয়ে প্রকাশ পায় এইভাবে -

"পদ্মার তুফান দেয় টান নৌকো খানখান
পেরিয়ে এসেছি কত সেতু
তোমার দুঃখের পাশে বসে আছে জনবল
চোখে রূপা ইলিশের দ্যুতি ।
আমিও প্রণাম করি
বুকে লাগে শ্যামল বিনয় ভূমি, তুমি
মাথায় রেখেছ হাত স্নেহভরে ।"

(কাব্য ঃ 'তুমিতো তেমন গৌরী নও' / ১৯৭৮)

মনীন্দ্র গুপ্ত ঃ কবি মনীন্দ্র গুপ্ত জীবনের কাছ থেকেই তাঁর কবিতার উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। পরিবর্তে কবিও জীবনের কাছে সরল হবার চেষ্টা করেছেন সোজা পথে তার মর্মের কাছে যেতে । 'মধুসূদন' কবিতায় মনীন্দ্র গুপ্ত গ্রাম-জীবনের অনুষঙ্গে লৌকিক বিষয়বস্তুকে রূপ দিয়েছেন এইভাবে -

"অন্ধকারে ঢাকা গ্রামের মেঠো পথে
ধানের গোছা বোঝাই দিয়ে
ছোট গোরুর গাড়ি ঘুমোতে ঘুমোতে চলেছে
বাড়ি গিয়ে সে পেট ভরে ভাত খাবে ।
গাড়ির পিছন দিকে একটা ঝোলানো লণ্ঠন
উঁচু-নিচু পথের দুলুনিতে দুলছে ।"

(মধুসূদন / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

কবির যে নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিজস্ব ভাষায় ঋদ্ধ এ কথার প্রমাণ রয়েছে 'চাঁদের ধেনু' কবিতায় -

"এখন গোধূলি বেলা
তাড়াহুড়ো নেই, টান নেই ।
পিঠ চাপড়ে দুই পাশে দুই উদাসী গোরুকে
মসৃণ জোয়ালে বাঁধে । শান্ত ইশারায় গাড়ি চলে ।

গোরুদের গায়ে মেঠো ঘাসবিন্নার গন্ধ, চাপড়ালেই
হাত ভরে ওঠে সেই ঘাসের নিঃশ্বাস ।''

(চাঁদে ধেনু / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

আশরাফ সিদ্দিকী ঃ লোক সংস্কৃতির অসংখ্য উপাদান নিয়ে ওপার বাংলার কবি আশরাফ সিদ্দিকীর কবিতার কায়া গড়ে উঠেছে । রামধনু রঙে রঞ্জিত হয়েছে তাঁর কবিতার অবয়ব । শষ্য, সন্তান, শ্রম আর প্রেমের সরল দর্শন দ্বারা পরিচালিত যে লোক সমাজ তা একান্ত ভাবেই উৎসব কেন্দ্রিক । যুথবদ্ধ জীবনে যে প্রেম-প্রীতি, ভাবের আদান-প্রদান সেই সমাজদর্শন ও সংস্কৃতির সম্পর্ককে সুন্দর করার কামনায় যে লোকক্রীড়া ও লোক-উৎসবে, তাকেই কবি আশরাফ সিদ্দিকী কাব্যরূপ দান করেন এইভাবে -

''লোকজ উৎসব দেখো টলোমলো
সোনার গাঁ প্রান্তর
কতরূপ খেলাধূলা ভুলে যাওয়া সংগীতের মেলা
হা-ডু-ডু, গোল্লাছুট, লাঠিখেলা, কুস্তি, আঁখবন্ধন
টগবগ ছেলে মেয়েদের সে কি এক আনন্দ উল্লাস ।''

('সোনার গাঁ' / কাব্য ঃ সহস্রমুখের ভিড়ে
(ঢাকা ১৯৯৭ / পৃষ্ঠা - ২৭)

দাউদ হায়দার ঃ ওপার বাংলার অসংখ্য কবিতায় লোকগীতি নির্ভরতার ছাপ স্পষ্ট । কবি দাউদ হায়দার 'ভাটিয়ালি গানে' কবিতায় লিখেছেন -

''এমন মাঝি ও ছেলে
নাগরিকতার বর্বর পিছুটান ফেলে
শূন্যতাময় চরাচর,
বিধ্বস্ত কণ্ঠস্বরে,
হঠাৎ ভাটিয়ালি গানে
গেয়ে ওঠে, নদীর উৎস ছিল এখানে ''

(শ্রেষ্ঠ কবিতা / ঢাকা / পৃষ্ঠা ১২২)

যে গানের সুর একান্ত ভাবেই নদীমাতৃক বাংলাদেশের নিজস্ব, সেই গান হয়েছে দাউদ হায়দারের কবিতার অন্যতম উপাদান । এই উপাদানে রয়েছে কবির লোকচেতনার প্রতিফলন ।

মোহাম্মদ রফিক ঃ ওপার বাংলার কবি মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় লোকবীক্ষা প্রসঙ্গে বলতে পারি যে তাঁর কবিতা দিয়েই তাঁকে চিহ্নিত করা যায় । নিজ জীবনের স্বচ্ছ ছায়াই যেমন কবিতার আস্থাশীল রূপ, ঠিক তেমনি সেই রূপ সকলে দেখে না, সকলের পক্ষে দেখা সম্ভবও নয় । কবিতা যদি প্রকৃত প্রস্তাবে কবিরই নিজস্ব অর্থবহ এক রূপ ধ্যান হয়, সৃষ্টিশীল প্রতিমা হয়, তবে তাকে বিশ্লেষণ করা সত্যিই অসাধ্য । তবুও কবিতার আলোচনা হয় । কারণ এই আলোচনায় কবিতা কিছুটা 'সহজ' হয় বৈকি । এই 'সহজ'-এর কথা প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ একবার জানিয়েছিলেন-

> ''সহজ করে লিখতে আমায় কহ যে
> সহজ কথা যায় না লেখা সহজে ।''

ওপার বাংলার কবি মোহাম্মদ রফিকের কবিতার আঙ্গিক-উচ্চারণ বিষয়ে ওপরের কথা গুলি মনে পড়ে । মাটির শেকড়ে প্রোথিত তাঁর আত্মা । তাই তিনি পারেন নি মাটির মমতাকে অস্বীকার করতে । বাংলার আবহমান জল-বায়ু-নদী-আকাশ তাঁর 'সহজ' কবিতায় 'সহজ' হয়ে ওঠে, যখন তিনি তার সাথে লোকজীবনের সুখ-দুঃখকে যোগ করেন অসীম অহংকারে -

> ''এই স্বপ্ন মাটির বয়সী
> বাঘা যতীনের রক্ত থেকে
> জেগে ওঠে প্রভাতী আকাশ ।
> বায়ান্নর প্রথম রোদ্দুর
> বাঁশের চালের ধার বেয়ে
> জানালা গলিয়ে ঢুকে পড়ে
> একাত্তরে দাওয়ার ওপর

চুলোর আগুনে ফোটে চাল
নবান্নের বিলোল আঘ্রানে
এই সাধ মেঘের সমান
জ্বলন্ত ক্ষুধায় মোটাভাত
জল ছাতিফাটা পিপাসায়।"

(খোলা কবিতা / নির্বাচিত কবিতা)

লোক-জীবন বীক্ষক কবি মোহাম্মদ রফিকের কবিতার দুটো বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো (১) তাঁর কবিতা পড়লে সহজেই অনুধাবন করা যায়, তিনি কবিতাকে কখনো 'সৃষ্টি' করতে চান না (২) কবিতা তাঁর কলমে নেমে আসে অনায়াসে। তাঁর 'কপিলা' কবিতাটি পড়তে পড়তে মনে হয়, তিনি শুধু কবি নন, চারণ কবিও বটেন-

"আয়রে করম আলী হাতি চাপি আয়
আয়রে করম বিবি ঘোড়া চাপি আয়
বাঘের পিঠেতে বইস্যা দক্ষিণের রায়
লম্বাচুল হাতে টাঙ্গি আ-লো কালুরায়
ল্যাজা শক্তি শরাসন তূণপূর্ণ বাণ
চাঁদ করে ঝকমক পিঠে ঢাল খান।"

('কপিলা' / নির্বাচিত কবিতা)

মোহাম্মদ রফিকের লোক জীবন-বীক্ষা সত্য-ভাষণে সার্থক, তাঁর উচ্চারণে অতিমাত্রিকতা নেই। সুন্দরকে যেমন তিনি অতিরঞ্জিত করেন না, খারাপকেও ভয়াবহ করে তোলেন না। এখানেই তিনি সার্থক। তাঁর কবিতার এই সংযম যে লোক-বীক্ষার ফলশ্রুতি তা মানুষকে এক বিশ্বাসযোগ্য সত্তার সন্ধান দেয়। কবির যে জীবনবোধ তা একান্ত ভাবেই বাংলার। এই বোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত পুরো বাংলাদেশ। বাংলার আবহমান জীবনধারায় প্রতিটি উপাদান উপকরণের সাথে কবির বোধের নিবিড় অন্বয়। তাই তিনি যখন লেখেন —

"ভীতত্রস্ত দিনান্তের ঘামে রক্তে সাজু ও রূপাই
ঘরে ফেরে শরীর শ্রমের কুষ্ঠ পোড়া দুই চোখে
অতীতের কোন এক নক্‌শিকাঁথা বোনে ভুল পাড়
গামছায় একমুঠো চাল লঙ্কা কয়েকটা আনাজ"
('গাওদিয়া' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

তখন জীবনের তীক্ষ্ণ সুইয়ের ফোড় তুলে তুলে এভাবেই নক্‌শিকাঁথা বোনা হয়ে যায় তাঁর কবিতায়। তিনি ফোঁড়ে তুলে আনেন বাংলাদেশ, এখানকার নদী, মাঝি, মাঝি-বউ, গেরস্ত, গেরস্ত-বৌ, মোমেনা, ফাতেমা সকলকে। আর এসব জীবনের সঙ্গে এক হয়ে মিশে থাকা বাংলার প্রকৃতি - অন্ধকার রাত, কালপুরুষ, শ্মশান, চিতা, বালি মাটি, সুপুরিগাছ — কোনো কিছুকেই বাদ রাখেন না তিনি। তাই "মোহাম্মদ রফিকের কবিতা বাঙালির মাটির অন্তরঙ্গ ধ্বনির বিশুদ্ধ উচ্ছ্বাস, বাঙলার নাড়ির নিবিড়তম ধ্বনি, রক্তের উষ্ণ শিহরণ। বাঙালি অনুধাবন করে তাদের জীবনের কাছাকাছি নিঃশর্ত, অঙ্গীকারবদ্ধ জীবনের দোলায়মান সুখ-দুঃখের আলেখ্য। কখনো দক্ষিণবঙ্গের, কখনো উত্তরবঙ্গের গ্রাম বাংলার সবুজ শিহরণ, নদীর ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস একসঙ্গে মিশে যায় কবির ধমনীতে।[২]"

নদীমাতৃক বাংলার লোক-জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নদীর কথা বার বার ঘুরে ঘুরে আসে মোহাম্মদ রফিকের কবিতায়। যে নদীর বুকেই মানুষের জীবিকার আয়োজন -

"চকিত দাঁড়ের শব্দ। মাঝিদের গুনটানা হেই..."[৩]

যে নদীর বুকে মানুষ নৌকা বায়, মাছ ধরে, লোকজীবনের সুখকথা রচিত হয় সেই নদীই আবার জীবন-কীর্তি নাশ করে কীর্তিনাশা। যতই ক্লিশে হোক, মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় সেই নদীভিত্তিক লোক জীবনের খন্ড খন্ড চিত্র বিধৃত হয়ে আছে এইভাবে -

"জল ভর কাঞ্চন কন্যা রে জলে দিয়া মন,
জল তুলে ধান ভেনে মাটি লেপে ভাত বেড়ে
হায়রে গতর খাকী তার আর চলেনা গতর।"
('এক বুক সুখ', মেঘে এবং কাদায়

মোহাম্মদ রফিকের কবিতা পড়তে পড়তে কবির মতো পাঠকও যেন একাত্ম হয়ে যান ব্যথাময়ী এই বাংলার সঙ্গে। এই বাংলার লোকজীবন মোহাম্মদ রফিকের হাতে তুলে দিয়েছে কলম, লোকজীবনের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে তাঁর অন্তরাত্মা। মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় পাই লোকজ বাংলার বাস্তব ছবি, যাতে রয়েছে হত-দরিদ্র মানুষের চির অভাব অনটনের অভিজ্ঞতা। খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে এরা কতই না অসহায়। আর তাই যতবার কবি বাংলার নদীভিত্তিক সৌন্দর্য কামনা করেন, ততবারই যেন এদেশের চিরদুঃখ কবির কবিতায় অনেকখানি অংশ দখল করে নেয়। 'কীর্তিনাশা' কবিতায় দেখি -

"ছেলে নিলি স্বামী নিলি একটিমাত্র মেয়ে তাকে নিলি
কি আর করবি তুই বড়জোর আমাকেও নিবি,
কার্তিকের ভোরবেলা বকুলের কান্নামাখা কুঁড়ি
পড়ে আছে, তার সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক ভারী গাঢ়।"

(কীর্তিনাশা / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

অথবা

"সখিনার বর তাকে বেচে গেছে ভিন হাটে
ভিনদেশী মরদের ঠাই
তবু তো সখিনা কই ভোলেনি তো হারামির মুখ
ঠোঁটের কামড় বিষ।"

('ডাক', মেঘে এবং কাদায়)

কবি মোহাম্মদ রফিক আমাদের শুনিয়েছেন লোকজ বাংলার হাসি-কান্নার আলেখ্য। বাংলাদেশের দরিদ্র অসহায় জীবন, খরা-বন্যার তাড়নায় অভাবী লোকের শুন্য গোলা, শুন্য হাঁড়ি, ক্ষুধা, যন্ত্রণা, বউ-ছেলেমেয়ে ফেলে চলে যাওয়া, কত অসহায় পুরুষের গল্প, নারীর যৌবন বিকিয়ে যাওয়ার দুঃখ অথবা লুট হওয়া যৌবনের ব্যথিত হাহাকার। লোকজীবনের আঞ্চলিক উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এ সবকিছু হয়েছে অন্তর্ভেদী। অনিন্দিতা ইসলামের কথাই, ঠিক "স্নেহময়ী বাংলার গভীর সত্তায় নিজেকে জড়িয়ে সাত সমুদ্র

তেরো নদী পার হন কবি বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির খোঁজে। সেই অদ্ভুদ বীচিই হল কবির বাংলাদেশ। দেশপ্রেমিক কবির হার্দ্য-কন্যা কবিতার জননী। যার মাটি খুঁড়লে কাঞ্চন মেলে। অবলোকনে সৃষ্টি হয় হাজারো কবিতা। .... বাংলার জীবনের সঙ্গে মিশে আছে অনেক রূপকথার গল্প। আর আমাদের মাটির রূপকথা তো আমাদেরই জীবনের কথা বলে। আমাদের দৈনন্দিন হাসিকান্নার মিশ্রণে একাকার হয়ে যায় কখনো রূপকথা, কখনো নদী-প্রকৃতি, কখনো তার সঙ্গে যুক্ত হয় মিথ। মোহাম্মদ রফিকের কবিতা তখন হয়ে ওঠে আমাদের মাতৃভূমির চিরায়ত ধ্বনি -

"বেহুলা হঠাৎ আঁতকে উঠে টের পায় তখনও লখীন্দর
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে তাকে, একটি অঙ্গ তখনও তার
শরীর গহ্বরে
তবে ভঙ্গিটা কী যেন রকম অপরিচিত
ডান দিকে ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেল
তাকিয়ে আছে ম্রিয়মান পিলসুজ
কালো কুচকুচে কুতকুত পাক খাচ্ছে
দুটো চোখ সর্পিষ্ণু নিঃশ্বাস একটি ফনা
বেহুলার আজ ফুলশয্যা, বাসর।"[৪]

('বেহুলা একরাত্রি একদিন', রূপকথা কিংবদন্তি
/মোহাম্মদ রফিক)

মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় আছে লোকজীবনের বাস্তব ছবি যা লোকজ প্রাণের স্বাধীন মনোবৃত্তির জলন্ত ঘোষণায় উদীপ্ত। কবির উচ্চারণে লোকজ শব্দের প্রাচুর্য আর জীবন সংগ্রামের দোলা এক চিপরিচিত বাংলাদেশকেই জাগিয়ে তোলে পাঠকের হৃদয়ের গভীরে। তাঁর কবিতায় শুধু বিশুদ্ধ উচ্ছ্বাস নেই, আছে প্রাণের নিবিড় ছোঁয়া। তাঁর কবিতা যেন সম্ভাবনাময় স্বপ্নের সবুজ অঙ্কুর যা মাটির মমতায় প্রত্যয়ী।

আফম ইয়াহিয়া চৌধুরী ঃ মাটি ও মানুষের কথা উচ্চারিত হয়েছে ওপার বাংলার আর এক কবি আফম ইয়াহিয়া চৌধুরীর কবিতায়। ভাটি বাংলার এই কবির

মধ্যে রয়েছে লোককবির ভাব-মানস । তাঁর কবিতাকে অনুপ্রাণিত করেছে সমাজ ও সমকাল যার সাথে মাঝে মাঝে যুক্ত হয়েছে লোকজীবনের নানা প্রসঙ্গ-অনুসঙ্গ । তিনি জনবিচ্ছিন্ন জীবনের কবিতা লেখন না । তাই তাঁর কবিতায় পাই মাটি ও মানুষের কথা । সমাজ ও সংস্কৃতিমনস্ক এই কবির কবিতায় পাই দর্শন-চেতনা । মানবগাড়ির সওয়ার হয়ে লৌকিক ঐতিহ্যের স্রোতধারায় কবি মিশিয়ে দেন তাঁর কবিতা -

"ছন্দে আনন্দে নন্দিত হয়ে আজ সমাগত নববর্ষ
বাঙালির শত জনমের প্রেমে উচ্ছল শুভ পুন্যাহ
তুমি রূপসী বাংলার প্রাণ স্পন্দন
সর্বজনীন মহোৎসব
চেতনায় প্রেরণায় সরল সংস্কৃতি
উচ্ছ্বাসে উল্লাসে জাতিসত্তার শাশ্বত স্বীকৃতি ।"

(কবিতা ঃ বর্ষ এল / সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ 'কাব্যস্নান' / সম্পাদনা-কাজল রসিদ ও পুলক ধর)

নৃপেন্দ্রলাল দাস ঃ বাংলাদেশের শ্রীভূমি সিলেটের কবি নৃপেন্দ্রলাল দাস । তাঁর কবিতায় লৌকিক সংস্কৃতির ধারাটি তিনি অব্যাহত রেখেছেন । তাঁর কাব্যের একটা বড় অংশের মধ্যে লোকসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায় । কোনো কবিতাতেই তিনি লোকজীবনকে লোকসংস্কার থেকে বিচ্ছিন্ন করে উপস্থাপিত করেননি । লোক-চেতনা ও মননের মধ্যে যে সব বিশেষ ধারণা, ঝোঁক, প্রবণতা বা বিশ্বাস দেখা যায় সেই বিচিত্র উপাদান সংগ্রহ করে কবি তাদের কাব্যরূপ দান করেছেন । যেখানে অভাব, সেখানেই কবি তাঁর খেদ প্রকাশ করেছেন । একটি উদাহরণ -

"ঐতিহ্যবিনাশী কিছু লোক যাত্রা কিংবা জারি
বন্ধ করে দেয় । বন্ধ করে দেয় পুজো, চড়কগাছ
গাজনের মেলা ।

ফেলে আসা জন্ম গাঁও
একরাশ স্বপ্ন ঢেলে দাও ।''

(কবিতা ঃ মৌলভীবাজার / 'কাব্যস্নান'
কাজল রসিদ ও পুলককান্তি ধর সম্পাদিত)

দেওয়ান মিজান ঃ লোক-জগতের অধিবাসীদের জন্মের প্রথম থেকেই ক্রমাগত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় এবং বিরুদ্ধ অবস্থার সাথে তাকে লড়াই করতে হয়। এই ভাবেই তাকে খাপ খাওয়াতে হয় প্রকৃতির সঙ্গে, এভাবেই সে সঞ্চয় করে অমূল্য অভিজ্ঞতা। কথাটা মনসামঙ্গলে বেহুলা সম্বন্ধেও যে সত্য তা আর একবার প্রতিভাসিত হয়েছে দেওয়ান মিজান-এর কবিতায় -

''গলে যায় লখাইয়ের সাধের বাসর
বেহুলা স্থির স্থিতো হয় মধ্যযামে
নিরেট পাথর ।

লোক কাহিনির ঐতিহ্যকে কবিতার ভাববস্তুর সাথে মিলিয়ে ওপার বাংলার কবি দেওয়ান মিজান কিভাবে গড়ে তোলেন কাব্যকায়া, তার সার্থক নিদর্শন 'আঙুল দূরত্ব ও ঝাপসা দৃশ্যাবলী' কবিতাটি -

বেহুলা কান্দিয়া চড়ে অসীম ভেলায়
কি সাপে কাটিলা লখাইরে
সি সাপে দংশিলা ।''

উপরোক্ত আলোচনা থেকে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের দু'বাংলার কবিদের কবিতায় লোকবীক্ষা প্রসঙ্গে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসা যায় -

১. অনেক স্বপ্ন নিয়ে কবিরা লোক-জীবন পথে পরিক্রমা করেছেন।

২. চলার পথে তাঁরা সংগ্রহ করেছেন অসংখ্য লোকোপাদান।

৩. বীক্ষণ-জনিত লোকপাদানগুলোকে তাঁরা ধ্বনিতাত্ত্বিক, শব্দতাত্ত্বিক ও বাক্যতত্ত্বের বহুধা বৈশিষ্ট্যে প্রয়োগ করেছেন।

৪. কবিতার মূল ভাব-কাঠামোর সঙ্গে আহৃত লোকউপাদানগুলি কখনো সূক্ষ্ম, কখনো সূক্ষ্মতরভাবে প্রয়োগ করেছেন কবিতায়।

৫. বৃহত্তর গ্রাম-প্রকৃতির স্পন্দনে লোক-জীবনের গতিময়তাকে ধরবার চেষ্টায় সফল হয়েছেন কবিরা।

৬. ভাষা ব্যবহারে অনেক কবি লোক-অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে লোকজীবন নির্ভর অথচ শিল্পসম্মত শাব্দিক ও বাচনিক প্রক্রিয়ায় সফল হয়েছেন।

৭. আলোচিত কবিদের প্রায় সকলেই লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোকযান, লোকরঙ্গ প্রভৃতিকে ইঙ্গিতময় শব্দ ও বাক্যে প্রয়োগ করে ভাববস্তুর প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখেছেন।

৮. লোক-উপাদানের সার্থক ব্যবহারে অনেক কবির কবিতা সৌন্দর্যে দ্যুতিময় ও শিল্প শোভায় ভাস্বর হয়েছে।

মূলত গ্রাম-মানুষের জীবনচর্চা নিয়েই লোক-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে থাকে। আমি একবারও বলছি না, নগরজীবন চর্চা লোক-সংস্কৃতির বিপ্রতীপে অবস্থান করে। কিন্তু গ্রাম-মানুষের যে আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ সুবর্ষণ ও সুফসলের চাকায় বাঁধা, নাগরিক জীবনে তা নেই। গ্রাম-সংস্কৃতি দেশের সমস্ত সুখ, সম্পদ ও আরাম-বিলাসের উপকরণ পুঞ্জীভূত হয়না। জীবনের উচ্চবাসনা, সূক্ষ্ম চেতনা, মেধার উন্মেষ, প্রতিভার মননশীলতা সবই শহরের বাজারে কাঁচামাল বা পণ্য হিসেবে বিকোয়। আর দিনের পর দিন গ্রাম ও নগরে সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ব্যবধান বাড়তে থাকে। তাই লোক-সংস্কৃতির বিকাশের কথা যদি বলি, তা গ্রাম-জীবনের ছোঁয়ায় প্রাণময় হয়ে ওঠে। যে লোক-সংস্কৃতি গাছপালা,

নদীনালা, বনপ্রান্তর, পাহাড়-পাথর সমৃদ্ধ, যে সব উপকরণের সাথে মানব অস্তিত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যাদের হাত বাড়লেই ছোঁয়া যায়, চোখ মেললেই দেখা যায় সেই ‘শাশ্বত’কে নাগরিক জীবনধারায় পাওয়া সম্ভব নয়। তাই লোক-প্রেক্ষিত, লোক-মানস, লোক-ঐতিহ্য প্রভৃতি শব্দবন্ধ গ্রাম বা পল্লীর কথা মনে রেখেই আমি ব্যবহার করেছি। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের যে সব কবি এপার-ওপার বাংলায় ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাঁচাবাড়ি, মেঠোপথ, খানাডোবা, নদীনালা, মাঠ, গাছ-গাছালি এবং তাদের ঘিরে থাকা ফসলের দিগন্ত বিস্তারী ক্ষেত, দেবদেবীর থান, মন্দির-মসজিদ-উপাসনাকেন্দ্র, কাঁটাঝোপ, বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ সরীসৃপ তাঁদের কাব্যের কনটেন্টে এনেছেন, আমি তাঁদের কথাই বলেছি আলোচ্য গবেষণা গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে। পল্লী-মানস পরম্পরাজাত বিশ্বাস থেকে প্রাপ্ত অভ্যাসের অনুবর্তন করে। কল্যাণের আশায় বা অকল্যাণ দূর করতে ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র, ওঝা-গুনিন চায়, মাদুলী-তাবিজ ধারণ করে, ‘হত্যা’ দেয়, মানত করে, গণক-জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হয়ে অজানা ভবিষ্যতের আভাস পেতে চায়। মানুষ মরে ভূত-পেত্নি হয়, তারা সুযোগ খোঁজে মানুষের অমঙ্গল করতে, জীবন্ত মানুষ অপবিদ্যা শিখে ডাইনি হয়ে সর্বনাশ করতে চায়। এই রকম অগণ্য বিশ্বাস, নিষেধের কথা-প্রসঙ্গ উঠে এসেছে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায়। বিশ্লেষণের আলোয় সেই কবিতাগুলি আমার বিচার্য বলে মনে হয়েছে। এই গ্রাম পরিবেশই এপার বাংলার সমর সেন সাম্য ও শান্তিতে উত্তরণের আকাঙ্খা করেন -

> ‘‘আশাকরি একদিন এ কান্তার পার হয়ে পাব
> লোকের বসতি, হরিৎ প্রান্তরে শ্যামবর্ণ মানুষের
> গ্রাম্যগানে গোধূলিতে মেঠো পথ ভরে,
> পরিচ্ছন্ন খোশগল্পে মুখরিত ঘনিষ্ঠ নগর।’’
>
> (শ্রেষ্ঠ কবিতা / ‘বাইশে জুন’)

ওপার বাংলার আল মাহমুদ কয়েকটি খন্ড ইঙ্গিতময় বর্ণনায় সেই গ্রামের ছবি তুলে ধরেন যেখানে লাউয়ের মাচায় ভেজা নীলশাড়ি, শুট্‌কির গন্ধময় বাতাস, চাষির বাড়িতে বলদের গন্ধভরা হাওয়া। এই গ্রামের মাটিই তাঁর কাছে ‘প্রিয়তমা’

"চাষির বিষয় বৃষ্টি ফলবান মাটি
আর কালচে সবুজভরা খানাখন্দহীন সীমাহীন মাঠ।
কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে
ভাবলাম এ মৃত্তিকা প্রিয়তমা কৃষাণী আমার।"

(প্রকৃতি)

এপার-ওপার বাংলার অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাঙালি কবিরা কেবল শব্দের খেলায় ব্যস্ত থাকেননি, মৃত্তিকালগ্ন জীবনের মেলায় ছিল তাঁদের অবাধ বিচরণ, মানুষের প্রাণে প্রাণে যে অদৃশ্য প্রবাহ চলে তাকে শব্দময় রূপ দিতে গিয়ে তাঁরা জীবনকে জাগিয়ে রেখেছেন। তাঁদের কবিতার বিষয়-উপকরণ আহৃত হয়েছিল গরিব কৃষক, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে সমাজে অবহেলিত অনাথ আতুরের প্রতি সহমর্মিতা থেকে।

অনীক মাহমুদ ঃ এমন অনেক কবিতা অনীক মাহমুদ আমাদের উপহার দিয়েছেন যেগুলিতে উপস্থাপিত পশুপাখি, গাছপালা, পাথর, মাটি, সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদি সর্বপ্রাণবাদের বিশ্বাসটি লুকিয়ে আছে। লোক-বিশ্বাসের একটি হল সর্বপ্রাণবাদ অর্থাৎ যে অর্থে মানুষ জীবন্ত ও সংবেদনী, সেই একই অর্থে বস্তুবিশ্বের সব বস্তুকে জীবন্ত ও চেতনা সম্পন্ন বলে ধারণা করা। 'দাবি' কবিতাটিতে কবি নিজের চেতনাকে শুধু বস্তুবিশ্বে আরোপ করেননি, তাকে সুবিস্তৃত করেছেন এই ভাবে -

"এখানে সময় হাসে সবুজের দাবি নিয়ে
মায়াবী প্রহর গুলো জারুল শিরীষের ফাঁকে
জীবনের রঙ খেয়ে তেপ্পান্নের নম্রনীল বুকের বসন্তে
সেই কবে থেকে সেজেগুজে বাড়িয়েছে
রূপশালী শ্যামের সোহাগ।"[৬]

কবির জন্মস্থান বাংলাদেশের মমেল গ্রাম। এই গ্রামের লোকজীবনের সাথে কবির ছিল অন্তরের যোগ। গভীর একাত্মবোধ ও পারস্পরিক নিবিড় আকর্ষণে কবি ছিলেন লোক সমাজেরই একজন। সহানুভূতি ও একপ্রাণতার স্নিগ্ধ মধুর দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল ছিল তাঁর অবারিত শৈশবের দিনগুলি। সেই লোকজীবনের শ্যামলিম স্মৃতি 'বিধ্বস্ত আত্মার গান'

হয়ে ধরা দেয় তাঁর কবিতায় -

"হায় অভাগিনী মমেল ! কিভাবে পুরাবো তোর
নিমীলিত চিত্তের পিপাসা ?
এখানে আমার রক্তমাংস নাড়িপুঁজ মাতৃজঠরের ছায়াচিহ্ন
এখানে আমার অবারিত শৈশব কৈশোর অর্কেডিয়া হয়ে
নরম নারীর হাতে জড়িয়েছে শ্যামলিম স্মৃতি ।"

('বিধ্বস্ত আত্মগান' / এইসব ভয়াবহ আরতি)

লোকজীবনের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত খাল-বিল, আমবাগান, বাড়িঘর, ঝোপ-জঙ্গল, গাঙ-শ্মশানের 'সিম্ফনি' যেন তাঁর কবিতাকে লোক জীবন-ছন্দে চিরকালের বিস্তৃতি দিতে চায়-

"এইখানে রোদেলা দুপুর খিন্ন খঞ্জনার কণ্ঠে
শৈশবের গল্প বলে,
খিসাতলা থেকে সাপকাটি, বড় পুকুরিয়া থেকে মতিয়া খালের বাঁকে
পদ্ম চিনি আমের মুকুলে নবীনতা শ্যামের সোহাগ,
ওপারের হরিচরণ ঋষিদের বাড়িঘর,
বড় জঙ্গলের সন্নিকটে ডুমুরের গাছ ঘিরে বিয়াবন ঝোঁপ
তারও উত্তরে গাঙের শ্মশান, বৈদ্যের ডাঙায়
শিলারের কারদানি
প্রতিটি স্পর্শের সঙ্গে আছে নিরুপমায় বয়সের -
মিঠেল সিমফিনি ।"[৭]

অনীক মাহমুদের কবিতায় বাংলাদেশের লোকজীবন, লোকবিশ্বাস কতখানি বর্ণময় হয়ে উঠেছে তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে আমি কবির আরো দুটি কবিতার অংশ উদ্ধৃতি হিশেবে এখানে ব্যবহার করলাম-

(১) "গোমতীর ঘোলা জলে ভিজতে ভিজতে মাছ ধরা ঠান্ডা ক্লান্ত
অসহায় জনক ফরাজ আলি ..... "

('সে' / এইসব ভয়াবহ আরতি)

(২) "............নদী হারিয়ে ফেলেছে দুর্বার যৌবন
মাঝির কণ্ঠে আসে না ছাপিয়ে ভাটিয়ালি গান
নবান্নের আমোদ উল্লসিত হয় না আর রাখালের বাঁশরি,
বন্ধ্যা মাটির কিংখাব থেকে ওঠে শূন্যতার রোনাজারি ।"
('আবাহন' / এইসব ভয়াবহ আরতি)

যেখানে একসময় সবুজের দাবি ছিল, মহুয়া-দারুল-শিরীষের ফাঁকে সময়ের প্রহর ছিল গুলো মায়াবী, জীবনের রং যেখানে ছিল নম্রনীল, হৃদয়ে ছিল রূপশালী ধানের সোহাগ, সেখানে আজ "বীভৎস অন্তরে হেঁকে যায় জিঘাংসা / শান্তির সামিয়ানা ওঠে না ফুল্ল চেতনা ।" তাই কবি উপদ্রুত লোকলয়-সমাজ-সংসারের মাঝে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, "তোমরাও তাদের এড়িয়ে চলো ।" কবি চান 'একমুঠো রোদের প্রাণদ মহিমা ।' 'সে' ও 'আবাহন' কবিতায় কবির লোকবীক্ষা তাঁকে ভারাক্রান্ত করে তোলে লোক-ঐতিহ্যের ক্রমিক অবক্ষয় জনিত বেদনায় ।

কবি পুষ্পজিৎ রায়ের লোকবীক্ষার ফসল তাঁর 'পরমা নামের কুসুমগুলি' কাব্যগ্রন্থটি । উত্তরবঙ্গের মানুষ হয়েও তাঁর কবিতায় শুধু এক বিশেষ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর লোক সংস্কৃতির উপাদান নেই, আছে বৃহৎ বঙ্গের লোক সংস্কৃতির বর্ণময় মিলন-মিশ্রণ । যে ছায়া সুনিবিড় বিপুল বটের কোলে আরামের মগ্ন আন্তরিকতা তা আসলে লোকজীবন সম্ভুত- একথা কবি কখনো বিস্মৃত হন না । তাই তাঁর লোকবীক্ষায় শহর নয়, গ্রাম বাংলার চিত্রই শব্দময় হয়ে ওটে বারবার-

"ছায়া সুনিবিড়
বিপুল বটের কোলে
আমাদের ছোটো খাটো শান্তির নীড়
মধুমাছি গুঞ্জরণ ঝিল্লির কলতানে
রাতগুলি ক্রমে গাঢ়তর,
শাসন অনুশাসন নয়

অন্তরঙ্গ নিজস্ব উঠোনে আমরা
মগ্ন আরামে।''

('অসামান্য' / পরমা নামের কুসুমগুলি)

লোক সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট মমতা, বিস্ময়, প্রশ্রয়, আগ্রহ ও সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে কবি প্রদীপ সরকারের কবিতায়। তাঁর 'হে প্রমিথিউস' কাব্যগ্রন্থের 'সন্ত্রাসী ষাঁড়' কবিতায় একটি আদিম সংস্কারকে আমরা খুঁজে পাই -

''মূলো আর মরিচের ক্ষেতে
শক্ত বাঁশের খুটোয়
ষাঁড়ের শুকনো করোটী অধোমুখে পোঁতা।
এতে নাকি নাকের নোলকের মত ঝুলে থাকা
টকটকে লাল টিয়ামুখ লঙ্কার কোনো অনিষ্ট
হয় না। চাষিদের বিশ্বাস।''

উপরে বর্ণিত হয়েছে নিরক্ষর লোকসমাজের প্রচলিত এক বিশেষ ধারণা -যাকে লোকসংস্কার বলতে বাধা নেই। এই ধারণা মানসিক ক্রিয়ারই ফসল। এতে যুক্তি অযুক্তির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও এই বিশ্বাসটি যাদুবিদ্যাগত লোকাচার থেকেই সৃষ্ট। 'ষাঁড়ের শুকনো করোটী' বিষয়ক যে লোকবীক্ষা সে প্রসঙ্গে দু-একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জীবন ও জগৎ মানুষকে জন্মের প্রথম থেকে ক্রমাগত প্রতিকূল অবস্থার মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং মানুষকে প্রতিনিয়ত বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে, খাপ খাওয়াতে হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে। এমনি ভাবে সে এগিয়ে গেছে সভ্যতার স্তর থেকে স্তরান্তরে, পথে পথে সে সঞ্চয় করেছে অমূল্য অভিজ্ঞতা। লোকসংস্কার এই অভিজ্ঞতার ফলমাত্র। প্রতিটি দেশের সমাজ কতকগুলো বিশিষ্ট নিয়ম-নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অর্থনীতি, আইন-কানুন ও শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে নানা সংগঠন নিরন্তর গতিতে কাজ করে। লোকসমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু বস্তুবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও, সমাজে এমন ঘটনা ঘটে, লোকে যা মোটেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মানুষ নিশ্চিন্তভাবে জমি চাষ করবার পদ্ধতি আয়ত্ব করতে পারে এবং কিভাবে, কোন আবহাওয়ায় ফসল

ফলবে, তাও মানুষ বলতে পারে। এক কথায়, পার্থিব বহু ব্যাপারে মানুষ কি ঘটবে বা ঘটবে না, তা পূর্বাহ্নেই অনেকাংশে জানতে পারে। কিন্তু একথাও সত্য যে মানুষ কখনো কখনো পূর্বাহ্নেই সবকিছু জেনে কাজ করতে পারে না। এমন কি, কলাকৌশলও সেখানে নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় না, এ ব্যাপারে Beals, Ralph Li & Hoijer, Harry 'An Introduction to Anthropology' গ্রন্থে জানাচ্ছেন, "It is true that human beings sommetimes fail to behave predictably and that techniques prove undepndable. An ordinary even-tempered person falls into an inexplicable rage. A faithful wife or husband suddenly deserts his spouse ; or an apparenty healthy individual suffers and dies for no apparent cause. A favourite bow, hitherto sound, breaks ; a piece of stone, despite careful handling, cannot be shaped into a tool or weapon, a mass of clay though treated in the usual manner, fails to hold its shape or produce an adcquate vessel careful hunting does not produce game, an unexpected rain or hailstorm destroys a seasonal crop, or a herd, despite all precautions is depleted by discease. Despite knowledge and timetested techniques, many everyday activities are subject to failure - not the failure that results from lack of skill or knowledge, but a failure that is inexplicable, unpredictable, and therefore mysterious. As a result of evevts life there disturbing to the even tenor of daily activity that we know develops certain patterns of behaving, designed to guard, by one means to another, against the unexpected, and better to control man's relatianships to the univesre in which he lives." [৮]

এসব ঘটনা প্রতিদিনের কাজকর্মে অশান্তি হিশেবে দেখা দেয়। ফলে সমাজে দৈব ঘটনার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। উপরোক্ত কাব্যাংশে 'ষাড়ের করোটী অধোমুখে পুঁতে' দেওয়ার পেছনে রয়েছে সুফলনের কামনা যা লোকসংস্কৃতিরই বিশেষ অংশ। কবি প্রদীপ সরকারের এই লোকবীক্ষা তাঁর নিবিড় জীবন-প্রীতির কাব্যিক প্রকাশ।

শাহ্ সোহেল ঃ বাংলাদেশের আর একজন কবি শাহ্ সোহেল-এর কবিতাতেও রয়েছে লোকজীবন-বীক্ষণের অভিজ্ঞতা। 'শুকনোতে আমার নাও' কবিতায় কবি যখন বলেন -

> ''ডর-বাধ নাই এই বুকে
> একদিন আমি নিষ্পাপ হব
> আল্লাহ তসবী গলায় নেব
> শুকনোতে আমার নাও ভাসবে সুখে।''[১]

তখন লোকসংস্কৃতিরই একটি বিশিষ্ট অংশ ধর্মভাবনা তাঁর মধ্যে কাজ করে। এই ভাবনা যে শুধুমাত্র অশিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, উপরোক্ত কবিতাংশটি তারই প্রমাণ। কবির বিশ্বাস, ''আল্লাহ তসবী'' তাঁকে সব ধরণের অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করবে। তিনি লোক-সমাজেরই একজন বলে তাঁর মধ্যে নানা সংস্কার বাসা বাঁধে এবং এই সংস্কারই তাঁকে নানা দুর্বিপাকের হাত থেকে রেহাই দেবার সাহস সঞ্চয় করে। 'আল্লাহ তসবীর' এর - সঙ্গে জড়িয়ে আছে কবির ধর্ম বিশ্বাস যাকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকে পৃথক করা যায় না। মানুষের চলার পথে জড়িয়ে আছে নানা ধর্মীয় উপাদান। এগুলি নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে মানুষের শরীর, রোগব্যাধি, জন্ম, শৈশব, কৈশোর ও যৌবন, মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, গৃহপালিত জীব-জানোয়ার, পাখি, ঘরবাড়ি, কৃষি, ধর্মীয় পবিত্র স্থান, পবিত্র পুস্তক, স্বপ্ন, মানুষ-জীবন, দৈনন্দিন কাজকর্ম, চলা-ফেরা, শোওয়া-খাওয়া, ঘুম-জাগরণ, রান্না-বান্না ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে। কবি তাই এখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেছেন জীবনের অনিশ্চয়তাকে দূর করার জন্য। অচিন্ত্যপূর্ব ঘটনা তাঁকে ঐশীশক্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করেছে।

অসিত দেব ঃ অসিত দেব বাংলাদেশের কবি। তাঁর কবিতায়'প্রকৃতি'-উপভোগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যে প্রকৃতিতে ষড়ঋতুর লীলা বৈচিত্র, যেখানে লোকজীবনের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক , যেখানে তার সাথে মিলিত হয়ে মানসিক অশান্তি-অস্থৈর্য-বিক্ষোভের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চান, নাগরিক জীবনের মোহ-জটিলতা থেকে

মুক্ত হতে চান সেই প্রকৃতি বিষয়ে 'স্মৃতিময় মনের মিনার' কবিতায় তিনি বলেছেন -

"মনু-ধলাইয়ের বাঁকে জনপদ,
হাওর-বাওর আর শ্যাওলাপদ্ম বিল
সফেদ বক অসীম আকাশ নীলে
জোনাক জ্বলা আঁধার
গেঁয়ো রাখালের পাগল করা বাঁশির সুর
পথ চলা গেঁয়ো মেঠোপথ
বাউলের একতারার অনুরণন
উল্লাসরত সাঁতারু বালক
জেলেদের ভিড়
কৃষাণের প্রশস্ত দাওয়া
বাবুই পাখির শিল্পিত ঘর
গুবাক , নারকেল আর কলাপাতার দুলুনি
উড়াল দেওয়া মাছরাঙা
চিল, শালিক- ময়না, বুলবুলি-কোকিল
চড়ুই আর ঘুঘুর পালক
মনু-অনু নদীর মালঞ্চ পালঙ্ক ।"

(পুলককান্তি ধর সম্পাদিত 'কখনো পাহাড়,
কখনো নদী' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত, পৃ ঃ ৩৪)

আনন্দের প্রতি আকর্ষণ প্রত্যেক মানুষের একটা সহজাত ধর্ম । এখানে কবির যা কিছু কর্ম, বক্তব্য ও ভাবনা -সব কিছুর মূলে যে প্রেরণাটি কাজ করেছে তা হল বঙ্গ-লোকজীবন ও বঙ্গ প্রকৃতির মধ্যে আনন্দানুসন্ধান । কবি এখানে আনন্দ আহরণ করেছেন লোকজীবন ও গ্রাম-প্রকৃতির নানা উপাদান থেকে । গ্রাম বাংলার নিঃসর্গ সংসারকে কবি উন্মোচিত করেছেন তাঁর আত্ম-উন্মেলক শক্তি দিয়ে । তাই তাঁর কাম্য "মনু-অনু নদীর পালঙ্ক ।"

আহসান উল্লাহ ঃ মুহম্মদ আহসান উল্লাহের কবিতায় এক ধরণের বেদনাবোধ রয়েছে যা লোক সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর ভাবে অন্বিত। যে পালা-পার্বন, চণ্ডীপাঠ, ঈদ, ফসল ভরামাঠ একসময়ে লোকজীবনকে নন্দিত করত সে সব আজ স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে কবির কাছে হাজির হয়েছে। আজ দারিদ্র ও অসাম্যের রূপ দেখে কবির বার বার মনে পড়ে সেই লোকজীবনের কথা-

"পাড়ায় পাড়ায় পুথির আসর কিংবা চণ্ডীপাঠ,
উপচে পড়া বুকের বধু, পূর্ণ ফসল মাঠ।
বারো মাসে তেরো পাবন, বছরে দুই ঈদ
খুসির চোটে পালিয়ে যেত ছেলের চোখের নিদ।"

আলোচ্য অধ্যায়ে এপার-ওপার বাংলার যে সব কবিদের লোকবীক্ষার কথা আলোচিত হল তাঁদের কবিতায় বাংলার লোকধর্ম, লোকবিশ্বাস, লোকাচার, লোকানুষ্ঠান, লোকশিক্ষা, গ্রাম্যছড়া, গালগল্প, কিংবদন্তি, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলা, শিল্পকলা, অশনবসন ইত্যাদির প্রত্যক্ষ উল্লেখ রয়েছে। কবিরা এসবের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন প্রাকৃত জনের কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রপ্রসারী, আত্মসমাহিতকারী ও আত্ম প্রসারকারী - এই দ্বিবিধ শক্তি।

তথ্যসূত্র ও ঋণস্বীকার

১. চক্রবর্তী বিপ্লব- লোকাভরণ ঃ আধুনিক কবিতা শৈলী, পৃষ্ঠা ৬৪

২. কালি ও কলম / চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা / আশ্বিন ১৪১৪ (ঢাকা) পত্রিকায় প্রকাশিত 'অন্যস্বর, অন্য আলো' মোহাম্মদ রফিকের কবিতা -অনিন্দিতা ইসলাম, পৃষ্ঠা ২০ ।

৩. 'চালচিত্র' কাব্য/ মেঘে ও কাদায় - মোহাম্মদ রফিক ।

৪. 'অন্যস্বর অন্য আলো' অনিন্দিতা ইসলাম, কালি ও কলম / চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা / আশ্বিন ১৪১৪ পৃষ্ঠা ২২-২৩ ।

৫. কবিতা ঃ আঙুল দূরত্ব ঝাপসা, দৃশ্যাবলী- দেওয়ান মিজান / সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ 'কাব্যস্নান' / সম্পাদক ঃ কাজল রসিদ ও পুলককান্তি ধর ।

৬. 'দাবি' / এইসব ভয়াবহ আরতি -অনীক মাহমুদ ।

৭. 'বিধ্বস্ত আত্মার গান' / এইসব ভয়াবহ আরতি - অনীক মাহমুদ ।

৮. Beals Ralhp L. and Hoijer / An Introduction to Anthropology / The Macmillan Company, New York / Page 527 -528.

৯. শাহ্ সোহেল / 'শুকনোতে আমার নাও' / কাব্যস্নান ।

১০. নায়ক জীবেশ ঃ বাংলা কবিতায় আধুনিকতা, পৃষ্ঠা - ১৮০ ।